STOP
ATROCITIES
ON
MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

ডিসেম্বর ২০১৬
নবপর্যায় ৪৪
মূল্য ১০ টাকা

ঐক্য পরিষদের গোলটেবিল সংলাপ

উচ্চ পদে কয়েকজন সংখ্যালঘুকে নিয়োগ দিয়ে উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

৯ ডিসেম্বর সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত গোলটেবিল সংলাপে নতুন নির্বাচন কমিশনে একজন যোগ্য সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার চির অবসান, শাহাবউদ্দিন কমিশন রিপোর্টের সুপারিশাবলীর বাস্তবায়ন, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন এবং পৃথক নির্বাচন নয় বরং যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আদলে জাতীয় সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্যে ৬০টি আসন সংরক্ষণের জোর দাবি জানানো হয়েছে।

গত বছরের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত মহাসমাবেশে ৭ দফা দাবি গ্রহণের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজের সভাপতিত্বে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক ড. অজয় রায়, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মহিউদ্দিন আহমদ, সাংবাদিক খন্দকার মুনিরুজ্জামান, সাংবাদিক সোহরাব হাসান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য এনামুল হক চৌধুরী, সাবেক রাষ্ট্রদূত

পৃষ্ঠা ২

সংখ্যালঘু অস্তিত্ব রক্ষায় ৭ দফা : উত্থাপনের এক বছর
গোলটেবিল সংলাপ
৯ ডিসেম্বর ২০১৬ শুক্রবার, সকাল ১০টা, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঐক্য পরিষদের গোল টেবিল সংলাপে সূচনা বক্তব্য রাখছেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ছবি : পরিষদ বার্তা

রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি

নির্বাচন কমিশনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আগামি ফেব্রুয়ারিতে গঠিতব্য নির্বাচন কমিশনে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অন্ততঃ একজনকে নিয়োগের জন্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানিয়ে ২২ ডিসেম্বর সকালে বঙ্গভবনে এক স্মারকলিপি প্রদান করেছে। রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁর সচিব সম্পদ বড়ুয়া তা গ্রহণ করেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, এ দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ জনপ্রতিনিধিত্বশীল সকল সংস্থার যে সব নির্বাচন ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে তার পূর্বাপর সময়ের অভিজ্ঞতা আপামর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্যে

পৃষ্ঠা ৭

জাতীয় সমন্বয় কমিটির ডাকে সারাদেশে অবস্থান কর্মসূচি

সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

আসন্ন নির্বাচন কমিশনে (ইসি) সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, সারাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করাসহ বেশ কয়েকটি দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনগুলো। ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটির ডাকে ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে দুপুর পর্যন্ত জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

সমন্বয় কমিটির অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে, সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় ভাবে সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে ৬০টি আসন সংরক্ষণ করা, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ও পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি আইন বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

অবস্থান কর্মসূচি থেকে নেতারা বলেছেন, এ দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ জনপ্রতিনিধিত্বশীল সব সংস্থার যেসব নির্বাচন ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে, ব্যতিক্রম বাদে সেগুলোর অভিজ্ঞতা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য দুঃখবহ ও দুর্ভাগ্যজনক। এমন কোনো নির্বাচন নেই, যে নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয়নি। অতীতে যেসব নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে, সেসব কমিশন সংখ্যলঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত

পৃষ্ঠা ২

গুজব রটিয়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আর কত?

অজয় দাশগুপ্ত

সংখ্যালঘু নির্যাতনে ২০১৬ সাল ছিল উদ্বেগজনক– আইন ও সালিশ কেন্দ্র এ অভিমত প্রকাশ করেছে। এ বছর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ১৯২টি বাসস্থান, ২টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ১৯৭টি প্রতিমা, পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, পাঁচটি জমি ও বসতবাড়ি

পৃষ্ঠা ৭

সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব চাই
বাংলাদেশের
গঠন কর
করতে হবে

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি : পরিষদ বার্তা

নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শরদিন্দু শেখর চাকমা, এএলআরডি-র নির্বাহী পরিচালক শামছুল হুদা, সাবেক সচিব আবদুল মতিন খান, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক আমিনুল ইসলাম বেদু, ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। গোলটেবিল সংলাপের শুরুতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত 'সংখ্যালঘুদের ৭ দফা: উত্থাপনের এক বছর' শীর্ষক আলোচনাপত্র উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় রায় বাংলাদেশ উল্টোপথে হাঁটছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দেশের উন্নয়নে সংখ্যালঘুরা কোন ভূমিকা পালন করতে পারছে না। তাঁর মতে রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকতে পারে না।

সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির বলেন, রাষ্ট্রধর্মের মধ্য দিয়ে নাগরিকদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও মৌলবাদী আদর্শের ভিত্তিতে টার্গেট করে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হচ্ছে।

তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের শিকার কেন হবে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা? তিনি বলেন, শুধু সংখ্যালঘুরা নয় আজকের বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ নিরাপদ নয়। সরকারের মধ্যে আপোসকামীতা রয়েছে। হেফাজতের সাথে আপোসকামীতা করে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল ঘটনা ঘটাচ্ছে। তিনি মনোজগতের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই-র উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। কবির বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক মূল্যবোধের উত্থান ঘটানো ছাড়া আজ আর কোন বিকল্প নেই।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, প্রশাসনের উচ্চ পদে কয়েকজন সংখ্যালঘুকে নিয়োগ দিয়েই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না। এর জন্যে প্রয়োজন কাঠামোগত পরিবর্তন। তিনি বলেন, হলি আর্টিজানের ঘটনার আগে প্রায় এক বছর ধরে দেশব্যাপী ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বগারদের একের পর এক হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার নির্লিপ্ত থেকে তা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু সেদিন যদি তারা জিরো টলারেন্স গ্রহণ করতো তা'হলে হলি আর্টিজেন ও শোলাকিয়ার ঘটনা ঘটত না। তিনি সংখ্যালঘুদের জনজীবনে বিরাজিত পরিস্থিতির জন্যে সরকার, রাজনৈতিক শক্তি ও সামাজিক আন্দোলনের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন। ড. দেবপ্রিয় বলেন, নিজ দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে অন্য দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তাদানের দাবি হাস্যকর। তিনি মায়ানমারের রোহিঙ্গা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপরে যে জাতিগত সহিংসতা চলছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মহিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের সবক'টি দলের নীতি নির্ধারকদের কাছে কোন সংখ্যালঘু নিরাপদ নয় উলেখ করে বলেন, আমাদের দেশ 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত' বলে যে শোগান দেয়া হয় তা রীতিমত হাস্যকর। তিনি বলেন, উন্নয়নের আগে নিরাপত্তা দরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও সদিচ্ছায় যারা বাধা দিচ্ছে প্রশাসন ও সরকারি দলের মধ্য থেকে তাদের চিহ্নিত করার সময় এসেছে বলে উলেখ করেন। মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা আওয়ামী লীগের বিরোধী নই তবে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের পথে চলুক এটাই আমাদের দাবি।

সাংবাদিক মনিরুজ্জামান বলেন, এ দেশ আমার নয়। এ দেশের জন্যে মুক্তিযুদ্ধ করিনি। সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতাকে রেখে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জগাখিচুড়ি রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ শক্তিশালী হচ্ছে বলে উলেখ করেন। মনিরুজ্জামান বলেন, সর্বনাশ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। আরও সর্বনাশের পথে দেশ হাঁটছে। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দলের সাম্প্রদায়িকীকরণ হচ্ছে।

সাংবাদিক সোহরাব হাসান আত্মজিজ্ঞাসার আজ বড় বেশি প্রয়োজন উলেখ করে বলেন, রসরাজ অপরাধ না করেও আজ জেলে। এটাই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থা। কোথায় মানবতা, কোথায় ধর্মনিরপেক্ষতা ? রাষ্ট্রীয় আবহ হচ্ছে সংখ্যালঘুদের জন্যে ভীতিকর। ক্ষমতাসীন সবারই রাজনৈতিক সমীকরণ হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তিনি দুঃখ করে বলেন, স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর আজকের বিজয় দিবসেও প্রশ্ন- মানুষের বিজয় কি অর্জন করতে পেরেছি ? দেশ যে পথে চলছে তাতে কোনদিনই কি বিজয় অর্জন করতে পারবো?

সাবেক রাষ্ট্রদূত শরদিন্দু শেখর চাকমা সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। মানবাধিকারকর্মী শামছুল হুদা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন আজ বিবর্ণ বলে উলেখ করে বলেন, দেশ সংখ্যালঘুশূন্য হলে গণতন্ত্রেও শূন্যতা আসবে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ, অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার আজ সময় এসেছে।

ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং সাংবিধানিক সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ৭ দফা দাবি
অবস্থান কর্মসূচি
আয়োজনে: বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, সিরাজগঞ্জ জেলা শাখা

সিরাজগঞ্জে অবস্থান কর্মসূচি। ছবি : পরিষদ বার্তা

রাষ্ট্র সবার
নাসিরনগরে হিন্দু এলাকায় এবং
সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন
জমি জবর দখলের

নওগাঁয় অবস্থান কর্মসূচি। ছবি : পরিষদ বার্তা

সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করার আশ্বাস দিলেও প্রতিফলন দেখা যায়নি। সে কারণে যে কোনো ধরনের নির্বাচন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবস্থান কর্মসূচিতে ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সিনিয়র সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক এবং সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্তসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত খবর নিম্নে দেয়া হল :

বরিশাল

বরিশালে মানবন্ধন করেছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে নগরীর সদর রোডের অশ্বিনী কুমার হলের সামনে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মহানগর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র দে নাড়ুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ দত্ত, সহ-সভাপতি সাংবাদিক গোপাল সরকার, অধ্যক্ষ সুজয় সেন, বিপুল বিহারী যুগ্ম সম্পাদক গোপাল সাহা ও অপূর্ব অপু।

মেহেরপুর

মেহেরপুরে মানবন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ। মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ডা. রমেশ চন্দ্র নাথের নেতৃত্বে মানবন্ধনে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক শাশ্বত নিপ্পন, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ বোস মনো। এ সময় সাংগঠনিক সম্পাদক দেবাশিষ বাপ্পী, সদস্য দ্বিজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, শিবালই মঠের পুরোহিত ধ্রুব চৈতন্য ব্রক্ষ্মচারী, হালদারপাড়া মন্দিরের সভাপতি আনন্দ কুমার হালদারসহ পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে অবস্থান কর্মসুচি পালিত হয়েছে। গোপালগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এক কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচি চলাকালে বক্তব্য রাখেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মঙ্গল চন্দ্র অধিকারী, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের গোপালগঞ্জের সভাপতি ডা. অসিত মলিক, খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের গোপালগঞ্জের যুগ্ম আহ্বায়ক ডেভিড বৈদ্য, জগন্নাথ হল অ্যালমনাই গোপালগঞ্জের সভাপতি অধ্যক্ষ অশোক কুমার সরকার, সুনীল কুমার দাস, গোপালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যুগল কিশোর বিশ্বাস নেতৃবৃন্দ।

বাগেরহাট

বাগেরহাটে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদযাপন পরিষদসহ ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু বিভিন্ন সংগঠন। শহরের সাধনার মোড়ে বক্তব্য রাখেন জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি শিব প্রসাদ ঘোষ, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অমিত রায়, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মিলন কুমার ব্যানার্জি, পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অবনীশ চক্রবর্তী সোনা, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস স্বপন দাস প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জ

সাংবিধানিক অধিকার, ধর্মীয়-জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষা ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহ ৭ দফা দাবিতে সিরাজগঞ্জে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আয়োজনে শনিবার সকালে শহরের মুজিব সড়কস্থ শ্রী শ্রী মহাপ্রভূর আখড়ার সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি এবং হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতা এ্যাড. সুকুমার চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুস সামাদ তালুকদার, পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কুমার কানু, এ্যাডভোকেট রণজিৎ মন্ডল স্বপন, এ্যাড. কল্যাণ সাহা, রঞ্জন মন্ডল তপা, বিজয় দত্ত আলোক, সঞ্জয় সাহা, জেলা জাসদ সাধারণ সম্পাদক নাজমুল ইসলাম মুকুল, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এ্যাড. মাহবুব এ খোদা টুটুল, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক সুকান্ত সেন, জেলা ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক সাংবাদিক দিলীপ গৌর প্রমুখ।

এছাড়া কর্মসূচিতে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অবস্থান কর্মসূচিতে ৭ দফা দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করা হয়।

জেলা কমিটির প্রতি অনুরোধ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা কমিটিসমূহকে জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন ও হামলার ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষদ বার্তার সম্পাদকীয় কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে ছবি ও স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সংযুক্ত করে পাঠালে তা পরিষদ বার্তায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

খুলনায় সার্কিট হাউজে মতবিনিময় সভা

দাসত্বের বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে ঐক্যের বন্ধন জোরদার করার আহ্বান

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিন রাতে খুলনা সার্কিট হাউজে এক মতবিনিময় সভায় দাসত্বের বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে সংখ্যালঘুদের ঐক্যের বন্ধন জোরদারের উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেছেন স্থানীয় নেতারা। তাঁরা বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রাজনৈতিক নেতাদের হয়রাণীর মুখোমুখি হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে না পারলে এরা ক্রমশঃই ভারতমুখী হবে।

বাংলাদেশ ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদ, খুলনা মহানগর শাখার সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত খুলনা আসেন। তাঁকে সামনে রেখে মুলতঃ এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্মল কুমার চ্যাটার্জী ও সহ-সভাপতি দিপালী চক্রবর্তী। মতবিনিময় সভায় অংশ নেন গণেশ চন্দ্র পাল, পঞ্চানন মন্ডল দেবাশিস রায়, বিজয় সরকার, অধ্যাপক মনোরঞ্জন মণ্ডল, ডাঃ আর কে নাথ, গোপাল সাহা, সুখময় বিশ্বাস, বিমান সাহা, সমীর সরকার, পরিমল দাশ, অরবিন্দ সাহা, এ্যাড. অলোকানন্দ দাশ, এ্যাড. বিনয় রায়, সাবেক সাংসদ ননীগোপাল মণ্ডল, বিজয় কৃষ্ণ মণ্ডল, এ্যাড. নবকুমার চক্রবর্তী, প্রদীপ রায়, অনিমেষ সরকার, প্রশান্ত হালদার, রতন মিত্র, অধ্যাপক শ্যামল দাশ, কৃষ্ণপদ দাশ, প্রশান্ত কুণ্ডু, বিমান বিহারী রায়, বিজয় কুমার ঘোষ, বীরেন ঘোষ প্রমুখ।

গণেশ পাল বলেন, অতীতে ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বে দুর্বলতা থাকলেও বর্তমানে তা থেকে বেরিয়ে আসছে। এটি আনন্দের। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় ঐক্য পরিষদের আন্দোলন এগিয়ে যাবে, এটি আজ আশা করতে পারি। পঞ্চানন মণ্ডল সাম্প্রতিক নাসিরনগরের ঘটনায় দুঃখ করে বলেন, এক জায়গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকলকে নিয়ে আসতে হবে। এ দায়িত্ব ঐক্য পরিষদকে নিতে হবে। দেবাশিস রায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন চাই।

বিজয় রায় বলেন, সংখ্যালঘুদের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও থানায় মামলা নেয়া হলেও তা নেয়া হয় দুর্বল ধারায়। এতে হামলাকারীরা পার পেয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপে পরে তা আর এগিয়ে নেয়া যায় না। অধ্যাপক মনোরঞ্জন পালিত সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংখ্যালঘুদের অংশীদারিত্ব প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের দাবি জোরদারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, জাল দলিল করে ভূমিখেকোরা সংখ্যালঘুদের দেবোত্তর ভূমিসহ জায়গা-জমি দখল করে নিচ্ছে।

ডাঃ আর কে নাথ সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণের দাবিকে জোরদারের উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম টিকে থাকতে পারবে না। গোপাল সাহা সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি গ্রাসে ভূমিগ্রাসীদের সহযোগিতায় নিজেদের মধ্যেকার বিভীষণদের চিহ্নিত করার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। সুখময় বিশ্বাস বলেন, সংখ্যালঘু নেতৃত্বকে দাসত্বের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার সময় এসেছে। বিমান সাহা বলেন, সংখ্যালঘু ঘটনায় মামলা হয়। বিচারে রায় হয় না। নিজেদের মনোবল অটুট রেখে সামনে এগুতে হবে বলে তিনি উলেখ করেন। সমীর সরকার খালিশপুরে শ্রমিক নিয়োগে ধর্মীয় বৈষম্যের অবসানে উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান। পরিমল দাশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিবেক জাগ্রত করার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। অরবিন্দ সাহা সংখ্যালঘুরা সম-অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে উলেখ করেণ। এ্যাডভোকেট অলোকানন্দ দাশ সংখ্যালঘুদের ঐক্যের বন্ধন জোরদারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, ৭২-র মৌল আদলে সংবিধানকে ফিরিয়ে আনতে হবে। দুলাল দাশ এ মর্মে অভিযোগ করেন যে, অর্পিত সম্পত্তির তালিকা থেকে অবমুক্তির আবেদন কেউ গ্রহণ করছে না।

এ্যাডভোকেট বিনয় রায় নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করে প্রশ্ন রেখে বলেন, ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্য আছে। তারা ভারত ছেড়ে কোথাও যায় না। আমরা যাচ্ছি কেন? তিনি একই মঞ্চে সব সংখ্যালঘুদের আসতে হবে বলে উলেখ করেন। এ্যাডভোকেট রায় বলেন, আঘাত যেখানে আসবে সেখানে প্রতিবাদ জানাতে হবে। তিনি একই সাথে নিজেদের মধ্যে নিজেদের শত্রু লুকিয়ে আছে বলে মন্তব্য করেন।

সাবেক সাংসদ ননী গোপাল মণ্ডল সংখ্যালঘুদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার হচ্ছে বলে উলেখ করনে। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা শুনতে শুনতে দেশ সংখ্যালঘুশূণ্য হয়ে যাচ্ছে। বিজয় কৃষ্ণ মণ্ডল হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, মানববন্ধন আর কত? এ্যাডভোকেট নবকুমার বিশ্বাস বলেন, সামনে নির্বাচন। নির্বাচন মানে ত’ নির্যাতন।

তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, এর থেকে পরিত্রাণ পাবো কবে? প্রদীপ রায় বলেন, দেবোত্তর সম্পত্তি যেখানে হুমকি সেখানে। অনিমেষ সরকার তার বক্তব্যে ধর্মীয় মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বিরাজিত বৈষম্যের কথা উলেখ করেন। প্রশান্ত হালদার বলেন, আজ অস্তিত্বের প্রশ্ন। কাপুরুষের মতো সংখ্যালঘুরা পালিয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে মতাভিন্নতা আছে, জাতপাতবর্ণে বিভক্তি আছে। সরকার গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূলো সংখ্যালঘুদের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে।

কৃষ্ণপদ দাশ ২০১১ সাল থেকে একটানা নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে বলে উলেখ করে বলেন, এর প্রতিবাদে-প্রতিরোধে আমরণ অনশন, কর্মবিরতি, ভোটবর্জনের মতো কর্মসূচি দেয়া যায় কি না তা’ আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে। অধ্যাপক শ্যামল দাশ বলেন, সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংখ্যালঘুরা প্রচন্ড আতংকে আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের ভূমিকা উজ্জ্বল নয়। তিনি আগামি সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে আগাম দিক নির্দেশনা দেয়ার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রশান্ত কুণ্ডু ধর্মশিক্ষার বিরাজিত বৈষম্য অবসানের পাশাপাশি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিমান বিহারী রায়ের মতে, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি উথ্যাপন আজ জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, অসহায় জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই।

দিনাজপুরে হরিজন পল্লীতে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ ১০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

নির্বাহী কর্মকর্তা শীলাব্রত কর্মকার জানান, রেলওয়ে কলোনীর হরিজন পল্লীতে অগ্নিসংযোগ ঘটনার পরপরই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড স্থান পরিদর্শন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি পরিবার প্রত্যেককে ৩০ কেজি করে চাল, ২ বান্ডিল করে ২০ বান্ডিল টিন, ৬ হাজার করে নগদ ৬০ হাজার টাকা, ৩টি করে ৩০টি কম্বল এবং শুকনো খাবার দেয়া হয়েছে।

বোচাগঞ্জ থানার অফিসার্স ইনচার্জ হাবিবুল ইসলাম প্রধান জানান, নাশকতার উদ্দেশ্যেই দুস্কৃতিকারীরা হরিজন পল্লীতে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়েছে। আটক আসামীকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ৪ ডিসেম্বর গ্রেফতারকৃত আসামী জুয়েলকে দিনাজপুর সদর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ড আবেদন জানানো হবে। আদালত থেকে রিমান্ড নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করা যাবে।

এব্যাপারে দিনাজপুরের পুলিশ সুপার মো: হামিদুল আলম জানান, এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে কিছু বলা যাবে।

এদিকে দিনাজপুরে হরিজন পল্লী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেছে মহিলা পরিষদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও প্রতিকার কমিটি।

৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে দিনাজপুর প্রেসক্লাবে কাহারোল উপজেলার ৩ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও বোচাগঞ্জ উপজেলায় ৭ হরিজনের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে মহিলা পরিষদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও প্রতিকার কমিটি। মানববন্ধন শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে অবিলম্বে দুস্কৃতিকারীদের গ্রেফতারসহ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি দাবি জানিয়ে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. মারুফা বেগম ফেন্সি।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মহিলা (তৃতীয় কলামে দেখুন)

সিরাজগঞ্জে ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন। ছবি : পরিষদ বার্তা

সিরাজগঞ্জে ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

॥ সিরাজগঞ্জ থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

গত ২৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ সিরাজগঞ্জ সদর থানা ও শহর শাখার ত্রি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকেলে শহরের শ্রী শ্রী যুগল কিশোর মন্দির আঙ্গিনায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্পদ দাশের গীতা পাঠের পর মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন সিরাজগঞ্জ জেলা ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক দিলীপ গৌর। উপস্থিত ছিলেন সদর থানা ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান একা পরিসদের নেতা এ্যাডভোকেট সুকুমার চন্দ্র দাস, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কুমার কানু, জেলা ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক বিধান সরকার ও গৌরাঙ্গ ঘোষ, সদস্য স্বপন চন্দ্র দাস, পরেশ মহাতো প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শহর ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি শুভ পোদ্দার, সাধারণ সম্পাদক শাওন পাল, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের নেতা সম্পদ দাশ, শুভ্র সরকার, অনিক কুন্ডু সৌরভ।

প্রথম অধিবেশন শেষে সদর থানা ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি রিংকু কুন্ডু এবং শহর শাখার সভাপতি শুভ পোদ্দার পুরাতন কমিটি বিলুপ্ত করে। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি পদে শুভ্র সরকার এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মানিক দাস এবং শহর শাখার সভাপতি হিসেবে অভিজিৎ সাহা তপু এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবির বিপুল রাহাকে নির্বাচিত করা হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে সভাপতি স্বপন চন্দ্র দাস কমিটির নাম ঘোষণা করেন। এই কমিটি আগামি ৩ বছর দায়িত্ব পালন করবে।

দ্বিতীয় কলামের পর

পরিষদের সভাপতি কানিজ রহমান, সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক তারিকুজ্জামান তারেক, উত্তর বাংলার নির্বাহী সম্পাদক জিনাত রহমান, রবিউল আউয়াল খোকা, আজাদী হাই, মনোয়ারা সানু, সুলতান কামাল উদ্দীন বাচ্চু ও মোছা: রুবিনা আখতার।

মহিলা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ হরিজনদের ওপর হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, মূলত জায়গা-জমি দখলের উদ্দেশ্যেই এই ধরনের হামলা চালানো হয়। প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে হরিজনদের উঠে দাঁড়ানো খুবই কঠিন হবে। নেত্রীবৃন্দ আরও হরিজনদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে বলেন, দুর্বৃত্তদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তারা যেন কোনোভাবেই ছাড়া পেয়ে না যেতে পারে সেটা প্রশাসনকে দেখতে হবে।

বিচিন্তা

আমার আমি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসীদের ভূমিকা ও অবদান

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নদী বিধৌত এই ভূমির ভূমিজ সন্তান সহজ সরল আদিবাসী সম্প্রদায়। জীবন ও জীবিকার তাগিদে ভারতবর্ষের মাটি চষে বেড়িয়ে এই বাংলায় থিতু হয়ে বসতি স্থাপন করে। প্রকৃতির সাথে মিতালী পাকিয়ে তারা বসবাস করে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। আদিবাসী সম্প্রদায় সর্বদাই নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট, শান্ত পরিবেশে বসবাসে অভ্যস্ত। তুলনামূলকভাবে কম ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বসবাস করতে তারা স্বাচ্ছন্দবোধ করে। জলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, গুহায় বসত গড়ে পশু-পাখী পালন ও শিকার, ফুল,ফল সংগ্রহ ও মাছ শিকারের মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। আগাছা পরিস্কার করে, বিষাক্ত পোকামাকড় আর নেকড়ের কামড় খেয়ে তারা ঊষর ভূমিকে উর্বর করে চাষাবাদ শুরু করে কৃষিকাজের সূচনা করে। ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড ভূমিতে জমায়েত হয়ে তারা গুচ্ছ গুচ্ছ পাড়া-গ্রাম তৈরি করে। নিজেদের বসতভিটা, জায়গাজমিতে স্বত্ব না ফলিয়েই তারা বংশপরম্পরায় বসবাস করতে থাকে। এসবে তাদের প্রথাগত সামাজিক অধিকারকে প্রাধান্য দিতো বলে কখনো ব্যক্তিমালিকানার পরোয়া করেনি।

কখনো মাসোহারা, বিনাপারিশ্রমিকে কষ্টকর কর্মসম্পাদন প্রভৃতির মাধ্যমে আদিবাসীদেরকে নিজেদের তৈরি সেই জমিতে বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়েছে। ফলে ইতিহাসের অনেক সময় তাদেরকে বিদ্রোহী হতে হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সংঘাত অনিবার্য হয়ে সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহ। যখনই কোনো একটা জায়গায় আদিবাসীরা বসত গেড়ে বসেছে তখনই সেই অঞ্চলের মূল জনগোষ্ঠী বা শাসকদলের লোকজন তাদের ধন সম্পদ কেড়ে নিয়ে আদিবাসীদের বিতাড়িত করেছে কিংবা দাসের মতো ব্যবহার করেছে। দখলদারগণ তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে, লুটপাট চালিয়ে, নারী শিশুদের উপর অমানুষিক নির্যাতন নিপীড়ন করে সেখান থেকে বিতাড়ন করেছে। এভাবেই তাদেরকে বার বার অবস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। সর্বকালে, সর্বযুগেই আদিবাসী সম্প্রদায় নির্যাতন, নিপীড়ন আর বঞ্চনার শিকার হয়েছে। রাষ্ট্র এবং সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে আদিবাসীরা সবসময়ই পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে এবং অভিশপ্ত জীবন যাপন করে চলেছে। আদিবাসীরা যখনই বুঝতে পেরেছে দেয়ালে তাদের পিঠ ঠেকেছে তখনই তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধের জন্য লড়েছে।

কখনো মাসোহারা, বিনাপারিশ্রমিকে কষ্টকর কর্মসম্পাদন প্রভৃতির মাধ্যমে আদিবাসীদেরকে নিজেদের তৈরি সেই জমিতে বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়েছে। ফলে ইতিহাসের অনেক সময় তাদেরকে বিদ্রোহী হতে হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সংঘাত অনিবার্য হয়ে সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহ। যখনই কোনো একটা জায়গায় আদিবাসীরা বসত গেড়ে বসেছে তখনই সেই অঞ্চলের মূল জনগোষ্ঠী বা শাসকদলের লোকজন তাদের ধন সম্পদ কেড়ে নিয়ে আদিবাসীদের বিতাড়িত করেছে কিংবা দাসের মতো ব্যবহার করেছে। দখলদারগণ তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে, লুটপাট চালিয়ে, নারী শিশুদের উপর অমানুষিক নির্যাতন নিপীড়ন করে সেখান থেকে বিতাড়ন করেছে। এভাবেই তাদেরকে বার বার অবস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। সর্বকালে, সর্বযুগেই আদিবাসী সম্প্রদায় নির্যাতন, নিপীড়ন আর বঞ্চনার শিকার হয়েছে। রাষ্ট্র এবং সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে আদিবাসীরা সবসময়ই পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে এবং অভিশপ্ত জীবন যাপন করে চলেছে। আদিবাসীরা যখনই বুঝতে পেরেছে দেয়ালে তাদের পিঠ ঠেকেছে তখনই তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধের জন্য লড়েছে।

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কমবেশি আদিবাসীদের বসবাস রয়েছে। দেশের পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য তিন জেলা রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। এখানে প্রায় এক ডজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রয়েছে গারো, মনিপুরি, খাসিয়া, বর্মণ, চা জনগোষ্ঠী, বানাই, কোচ, ডালু, হাজংসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের প্রায় সবজেলাতেই রয়েছে আদিবাসীদের বসবাস। এই এলাকায় সাঁওতাল ও ওরাঁওদের আধিক্য লক্ষ্যণীয়। এছাড়াও রয়েছে মাহাতো, মালো, মালপাহাড়িয়া, মুন্ডা, তুরি, রাজবংশী সহ আরো কিছু জাতিগোষ্ঠী। উপকূলীয় অঞ্চলে রয়েছে রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীতে এক সময় প্রায় লক্ষাধিক রাখাইনদের বসবাস ছিল বর্তমানে তা তিন হাজারে নেমে এসেছে। ভূমি উচ্ছেদ হতে হতে বর্তমানে আদিবাসীদের এই সংখ্যা মারাত্মক হারে হ্রাস পেয়েছে বরেন্দ্র, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, রংপুর ও পার্বত্য এলাকাতেও। বিশেষ করে জিয়াউর রহমান এবং এরশাদের শাসনকালে চার লক্ষাধিক উপকূলীয় অঞ্চলের অদক্ষ এবং পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ চরাঞ্চলের অভাবী বাঙালি শরণার্থীদের বিপুল সমাহার ঘটিয়ে আনুপাতিক ব্যবধান কমিয়ে এনে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলকে বাঙালি শরণার্থীদের সেখানকার সংখ্যাগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রাজশক্তি বা মূল জনগোষ্ঠীর সাথে কোন্দল বা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ জীবন যাপনের কারণে আদিবাসীরা তাদের পছন্দমত জায়গাগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতে থাকে। জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধিতে ভূমিব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে আদিবাসীরা কোনঠাসা হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়েই তারা নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস শুরু করে। কিন্তু তাদের সেই বসতভিটা ও প্রস্তুতকৃত জমিতেও যখন ভূমিদস্যু বাহিনীর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তখন আবারো লড়াই শুরু হয়ে যায়। একারণেই বিভিন্ন সময়ে এই বঙ্গভূমিতে সংঘঠিত হয়েছে সাঁওতাল বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, খড়ুই বা খাড়া বিদ্রোহ, নাচোল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, নানকার আন্দোলন, ভানুবিল বিদ্রোহ, মুন্ডাদের উলগুলান, কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি। এরকম খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের সমন্বিত অগ্নিরশ্মিই বাঙালির স্বাধীনতার চেতনাকে উসকে দেয়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যার বহিপ্রকাশ ঘটে। সময়ের আবর্তে তা পরিপুষ্ট হয়ে '৭১ এ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন এদেশের আদিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হন। নৌকার ভোটার হওয়ার কারণে যুদ্ধকালীন সময়ে দেশে থাকাটা তাদের কাছে নিরাপদ না হওয়ায় সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। শরণার্থী শিবিরের সরবরাহকৃত রেশন খেয়ে আলস্যে দিনযাপন করার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না কারো। সংগঠকদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সাগরাম মাঝি, পৌল চারোয়া তিগ্যা, খাগড়াছড়ির মং সার্কেলের রাজা মপ্রু সেইন, বরগুনার উ সুয়ে, কক্সবাজারের উসিট মং, নেত্রকোনার এ্যাড. প্রমোদ মানকিন, ময়মনসিংহের রেভারেন্ড ক্লেমেন্ট রিছিল, বিন্দুনাথ হাউই, দীপংকর দেওয়ান, রামগড়ের কোম্পানী কমান্ডার হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা।

তারা শিবির ক্যাম্পগুলোতে ঘুরে ঘুরে যুবকদেরকে উৎসাহ দিতেন যুদ্ধে যাবার জন্য। তাদের কথা ও নির্দেশনা শুনে দলে দলে আদিবাসী যুবকরা ইয়ুথ ক্যাম্পে যেয়ে নাম লেখাতে থাকেন। স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়েই তারা দখলদারদের হাত থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাধারণ যোদ্ধাই শুধু নন কোথাও কোথাও প্লাটুন ও কোম্পানী কমান্ডারের দায়িত্বে থেকে সফল অপারেশন চালিয়ে সেই এলাকাকে হানাদার মুক্ত করেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজাকার ও পাক-আর্মিদের গতিবিধি রেকি করে অপারেশনে নেমেছেন। কখনো রেললাইন উড়িয়ে দিয়ে কখনো বা ব্রীজ উড়িয়ে দিয়ে পাক আর্মিদের যাতায়াত রুদ্ধ করেছেন। আবার দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি আর্মিদের ক্যাম্প এবং থানা ঘেরাও করে সাড়াশি আক্রমণে পর্যুদস্ত করে অস্ত্র লুট করে শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। রংপুরে বুদু ওরাঁও-এর নেতৃত্বে হাজার হাজার আদিবাসী সাঁওতাল ওরাঁও বাঙালি নারী পুরুষ সনাতন অস্ত্র নিয়ে ২৮ শে মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি আর্মিদের ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও ও আক্রমণে সমবেত হলে পাকিস্তানি সেনার অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে শহীদ হন শত শত সাঁওতাল ওরাঁও বাঙালি। বিক্ষুব্ধ মুক্তিকামী জনতা এরপরেও রংপুর ক্যান্টনমেন্টকে অবরুদ্ধ করে রাখে। সেদিন ঘাঘট নদীর জলে আদিবাসী বাঙালির সম্মিলিত রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়।

তারা ক্যাম্পগুলোতে ঘুরে ঘুরে যুবকদেরকে উৎসাহ দিতেন যুদ্ধে যাবার জন্য। তাদের কথা ও নির্দেশনা শুনে দলে দলে আদিবাসী যুবকরা ইয়ুথ ক্যাম্পে যেয়ে নাম লেখাতে থাকেন। স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়েই তারা দখলদারদের হাত থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাধারণ যোদ্ধাই শুধু নন কোথাও কোথাও প্লাটুন ও কোম্পানী কমান্ডারের দায়িত্বে থেকে সফল অপারেশন চালিয়ে সেই এলাকাকে হানাদার মুক্ত করেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজাকার ও পাক-আর্মিদের গতিবিধি রেকি করে অপারেশনে নেমেছেন। কখনো রেললাইন উড়িয়ে দিয়ে কখনো বা ব্রীজ উড়িয়ে দিয়ে পাক আর্মিদের যাতায়াত রুদ্ধ করেছেন। আবার দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি আর্মিদের ক্যাম্প এবং থানা ঘেরাও করে সাড়াশি আক্রমণে পর্যুদস্ত করে অস্ত্র লুট করে শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। রংপুরে বুদু ওরাঁও-এর নেতৃত্বে হাজার হাজার আদিবাসী সাঁওতাল ওরাঁও বাঙালি নারী পুরুষ সনাতন অস্ত্র নিয়ে ২৮ শে মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি আর্মিদের ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও ও আক্রমণে সমবেত হলে পাকিস্তানি সেনার অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে শহীদ হন শত শত সাঁওতাল ওরাঁও বাঙালি বিক্ষুব্ধ মুক্তিকামী জনতা এরপরেও রংপুর ক্যান্টনমেন্টকে অবরুদ্ধ করে রাখে। সেদিন ঘাঘট নদীর জলে আদিবাসী বাঙালির সম্মিলিত রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়।

যোদ্ধা হিসেবে কয়েক হাজার শারীরিকভাবে সক্ষম আদিবাসী যুবক, বয়স্ক সবাই যুদ্ধে নামেন। তিনশতাধিক সাঁওতাল যুবক অংশগ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধে। বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন অনেকেই।

শুধু যে পুরুষরাই যুদ্ধে বিপুল বিক্রমে লড়েছে তা নয় নারীরাও যুদ্ধে সহায়তা করেছে। কেউবা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিয়ে, তথ্য আদান প্রদান করে, কেউ কেউ অস্ত্র সরবরাহ করে কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে। সোনামনি, মালতী, সোহাগিনীদের কথা আমরা জানি। দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার জসপিন টপ্য, কক্সবাজারের ডা. নেনিয়ে চিন, এথিন রাখাইন, নেত্রকোনার লতিকা এন. মারাক, সন্ধ্যা ম্রি, ভেরুনিকা সিমসাং, রেনুকা ম্রি, উর্মিলা জ্যাম্বেল, খাগড়াছড়ির বসুন্ধরা দেওয়ান, জ্যোতিপ্রভা দেওয়ানসহ অগণিত সেবাদাত্রী নারী দল।

স্বাধীনতার দুর্মর আকাংখাকে পুঁজি করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশের করুণ দশা দেখে তারা আজ মর্মাহত। যে আশা স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন তা মরিচিকার মতোই মিলিয়ে গেল যেন। আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই হাহুতাশ করেন, নিরবে চোখের জল ফেলেন, বিলাপ করেন মানসিক রোগীর মতো। এখনো সকল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মেলেনি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, সম্মাননা। নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন খণ্ডিত স্বাধীনতাকে। আদিবাসী বলে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য হন অনেক মুক্তিযোদ্ধা। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে হেনস্থা হয়ে মুক্তিযোদ্ধা বুদু ওরাঁওদের মতো বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরও দেশত্যাগ করতে হয় বাধ্য হয়ে, নিরবে।

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিপালনে রাষ্ট্র যেন নির্বিকার। (চলবে)

বিদায় ২০১৬, স্বাগত ২০১৭

॥ পর্যবেক্ষক ॥

বিদায় ২০১৬, স্বাগত ২০১৭। অনেক ক্লেদাক্ত পথ পেরিয়ে বাংলাদেশ ইংরেজি নতুন বছরে পা রেখেছে। বাঙালির জীবনে ১লা বৈশাখ নববর্ষ আসে, ঐতিহ্য ও উদ্দীপনার নতুন বার্তা নিয়ে। বাংলা নববর্ষের উৎসব আমাদের সংস্কৃতি ও সমাজ চেতনার গভীর প্রোথিত, যার অভ্যুদয় ঘটে ১লা বৈশাখের সূর্যোদয়ে। নববর্ষ আবাহন, শোভাযাত্রা, মেলা–যার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় আমাদের হাজার বছরের ঐক্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ। ইংরেজি নববর্ষ আমাদের উপনিবেশিক আমলে কর্মধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এখন প্রত্যেকটি মুহূর্ত এই বর্ষপঞ্জিতে আবৃত, আন্তর্জাতিকভাবে। ইংরেজি নববর্ষের সূচনা হয় ৩১ ডিসেম্বরের রাতে ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর পেরোতেই। রাজধানী এক অন্যমাত্রা গ্রহণ করে, উৎসবের এক নতুন আঙ্গিক। আমাদের তারুণ্য এই উৎসবকে ভিন্ন চেতনা দিয়েছে। সে যাই হোক, ইংরেজি নববর্ষও স্বাগত।

স্বাভাবিকভাবে পেছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন আছে, যাকে সালতামামি বলে গণ্য করা হয়। পেছন ফিরে তাকিয়েই সামনের দিকে এগুনোর পথ খুঁজতে হবে। বিগত বছর কেমন কেটেছে বাংলাদেশ-এর জবাব এক কথায় হবে না। জাতি হিসেবে আমরা এগিয়েছি- অর্থনৈতিকভাবে আমাদের অগ্রযাত্রা প্রশংসনীয়, একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হচ্ছে, জঙ্গিবাদ নির্মূলে বাংলাদেশে কঠোর ভূমিকা নিয়েছে, যা আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন অনেক উন্নত দেশের চাইতেও উল্লেখযোগ্য। তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব করছে বাংলাদেশ। জীবনমানে পরিবর্তন আসছে। এসব ইতিবাচক দিক অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু এও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রায় সাড়ে চার দশকেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কাঙ্খিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছুতে পারিনি। যে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে কবর দেয়ার জন্য একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, জাতির জনকের নির্দেশে কিছু পাকিস্তানি ছাড়া সব বাঙালিই হানাদার প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ২০১৬ অবসানে আজ বলতে হচ্ছে, সেই ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপোস করেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে চলতে হচ্ছে। ক্ষমতায় যাওয়া আর ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্য মুক্তির সার্বিক স্বপ্নকে দূরে যেন সরিয়ে দিচ্ছে। দুঃখজনক হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়ে বাহাত্তরে প্রণীত সংবিধান সেই চেতনা ধরে রাখতে পারেনি রাজনীতিকদের ক্ষমতার স্বার্থে আপোসকামীতার কারণে। আজ বলতে হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে দেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল সে দেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, এদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম।

২০১৬ সাল ছিল জঙ্গিবাদের উদ্যত থাবায় ক্ষত-বিক্ষত। এখন এই উগ্র ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স এর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে যেদিন পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানের চরিত্র পরিবর্তন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা বাতিল করেন, আমাদের রাজনীতিকরা ভয়ে এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অনুসারীদের না চটানোর নীতি গ্রহণ করে 'মৌনীবাবা' হয়ে গেলেন। সারাদেশে পরাজিত পাকিস্তানি অপশক্তির দোসররা আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। পাকিস্তান ফিরিয়ে আনার তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর ফের নির্যাতনের খড়্গ নেমে এলো। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর বিরুদ্ধে সেদিন প্রতিবাদের পতাকা তুলে ধরেছিল কিন্তু বিবেকমান মানুষ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। কারণ ধর্মীয় সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ তখনই আঁচ করতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানি ধারায় ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব সংকটে পড়তে হবে। পঞ্চম সংশোধনীর ধারাবাহিকতায় অষ্টম সংশোধনী এসে বুঝিয়ে দিল ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের আশংকা অমূলক ছিল না। জঙ্গিবাদের ভিত্তি তৈরি হয় এভাবে। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কথা যারা বলেন, তারাও আপোষকামিতা থেকে বিরত হননি। এভাবে বিষবৃক্ষ পরিপুষ্ট হয়েছে। আজ গোটা জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ার পেছনে এই ইতিহাস যদি আত্মানুসন্ধানে আমাদের কিছুটা হলেও সাহায্য করে তবেই মঙ্গল। ২০১৭ সালকে যদি আত্মানুসন্ধান বর্ষ ঘোষণা করে এগুনো যায় জাতি বাঁচবে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

২০১৬ সালে জঙ্গিবাদের ভয়াবহ ছোবল বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের ভিত্তি নড়বড়ে নয়। যদিও সরকার দাবি করছে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া হয়েছে, এখন লেজে প্রাণটুকু

পৃষ্ঠা ৭

২০১৬ সাল ছিল জঙ্গিবাদের উদ্যত থাবায় ক্ষত-বিক্ষত। এখন এই উগ্র ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স এর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে যেদিন পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানের চরিত্র পরিবর্তন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা বাতিল করেন, আমাদের রাজনীতিকরা ভয়ে এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অনুসারীদের না চটানোর নীতি গ্রহণ করে 'মৌনীবাবা' হয়ে গেলেন। সারাদেশে পরাজিত পাকিস্তানি অপশক্তির দোসররা আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। পাকিস্তান ফিরিয়ে আনার তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর ফের নির্যাতনের খড়্গ নেমে এলো। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর বিরুদ্ধে সেদিন প্রতিবাদের পতাকা তুলে ধরেছিল কিন্তু বিবেকমান মানুষ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা।

দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করতে হবে

রাখাল চন্দ্র মিত্র

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এদেশে বড় কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না। কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। সাম্প্রদায়িকতার বীজ এবং পরিবেশ দুটোই এখানে বর্তমান। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের (বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়) উপর সারা বছর ধরেই কোন না কোন স্থানে হামলা, প্রতিমা ভাংচুর, মন্দির অপবিত্রকরণ, ঘর-বাড়ি, জমি-জমা দখলের মাধ্যমে নিপীড়ন-নির্যাতন অব্যাহত থাকে। বিশেষ করে দূর্গা পূজার সময় এবং নির্বাচনের আগে পরে এগুলো বৃদ্ধি পায়।

এরূপ সম্প্রদায়িক আচরণের কারণ তিনটি :

এক) ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি : ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণেই মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এটিকে উগ্র মৌলবাদীরা জিহাদ বা সওয়াব অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য করে থাকে।

দুই) রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি : নির্বাচন এবং ভোট এক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সব রাজনৈতিক দল ও কর্মীরা হিন্দুদের ভোট প্রত্যাশা করে। কিন্তু কেউই সে প্রত্যাশা পূরণে পুরোপুরি আস্থাশীল হতে পারেন না। তাই ভোটের আগে ভয় দেখিয়ে ভোট পাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। আর পরে ভোট দিয়েছে কি দেয় নাই সেই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হিন্দুদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে। বিজয়ী এবং বিজিত কেউই কম যান না। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী পক্ষের আচরণ এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। বিজয়ীরা মনে করে তারা ভোট দিলে ভোটের ব্যবধান আরও বাড়ত। আর বিজিতরা মনে করে তাদের ভোট না দেয়ার ফলেই তাদের এই পরাজয়। এ অবস্থা হিন্দুদের জন্য শাঁখের করাতই বটে। তা হলে দাঁড়াল এই যে, হিন্দু ভোটই নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের একমাত্র না হলেও অন্যতম মাপকাঠি।

একদল বা পক্ষ মনে করে হিন্দুরা অন্য দল বা পক্ষের ভোট ব্যাংক। হিন্দু বিতাড়নের মাধ্যমে এই ভোট ব্যাংক দেউলিয়া করতে পারলে এক পক্ষের ভোট কমবে এবং অন্য পক্ষের নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম হবে।

তিন) ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি : এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সম্পত্তি দখল ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে থাকে। এক শ্রেণি মনে করেন, হিন্দুরা যেহেতু অবিশ্বাসী, মূর্তি পূজক, মুসরেক তাই তাদেরকে ইসলামের শত্রুরূপে গণ্য করা যেতেই পারে। আর শত্রুদের সম্পত্তি 'গণিমতের মাল' হিসাবে দখল করাও খুব একটা অন্যায় হবে কেন? রাষ্ট্র ব্যবস্থাও এক্ষেত্রে মোটামুটি অনুকূল। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাঙালি হিন্দুদের সম্পত্তি (বাড়ি-ঘর, জমি-জমা) 'শত্রু সম্পত্তি' রূপে ঘোষণা দেয়া হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে নাম পাল্টিয়ে করা হয় 'অর্পিত সম্পত্তি'। বিষয় ও বিবেচনা একই। জমি-জমা সংক্রান্ত দখলবাজির ৯০ শতাংশই এই শত্রু তথা অর্পিত সম্পত্তির কারণেই।

অতএব এর প্রতিকার ও প্রতিবিধান কি? প্রতিকার-প্রতিবিধানের একমাত্র রাস্তা মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল সংস্কার। সাত চলিশের দেশ বিভাগের সময় দ্বিজাতি তত্ত্বভিত্তিক মুসলিম মানস কাঠামো স্বাধীন বাংলাদেশেও অনেকাংশেই বহাল আছে। এই তত্ত্বের মূল কথা হল হিন্দু-মুসলিম দুটি পৃথক জাতি এবং তাদের আবাসভূমিও হতে হবে পৃথক। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে একথা খাটে না। এদেশ হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান আদিবাসী সকলের। বাংলাদেশ একমাত্র বাঙালিরই।

ধর্মীয় উগ্রপন্থী মৌলবাদীরা প্রতিমা-মন্দির ভাঙাকে সওয়াবের কাজ এবং বেহেস্তে যাবার রাস্তা মনে করে। এপথ সঠিক পথ নয় এবং ইসলামও এটাকে সমর্থন করে না। তা বুঝতে হবে এবং এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

অন্যের মাল 'গণিমতের মাল' হিসাবে লুটপাটের যোগ্য এ ধারণা বদলাতে হবে। এরপর আসবে বিচারের প্রশ্ন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে "জিরো টলারেন্স" এর আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও তদন্ত, বিচার ও শাস্তিদানের বিষয়টি যথাযথভাবে এগোচ্ছে না। প্রশাসনের গাফিলতি অর্থাৎ সর্ষের মধ্যে ভূত আছে কি না ভেবে দেখা দরকার। এ ব্যাপারে যতটা বাগড়ম্বর শোনা যায় ততটা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনা সত্ত্বেও সাহাবুদ্দিন চুন্নু কমিশনের রিপোর্ট এখনও আলোর মুখ দেখেনি এবং বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থাও করা হয়নি। এটা ভাল আলামত নয়। এতে বিচারহীনতা বা বিলম্বিত বিচারের সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে। যা দুস্কৃতকারীদের উৎসাহ যোগানোর শামিল।

তদন্ত ও বিচারের এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণ হয়তো এই যে এর সংগে কোন না কোনভাবে ধর্মীয় অনুভূতির একটি যোগসূত্র এবং ক্ষমতা লিপ্সুদের সংশিষ্টতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

অতএব, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল সংস্কার সাধন করেই পরিস্থিতির অবসান ও উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

কোন দেশের সংখ্যালঘুদের মর্যাদার সংগে সমান নাগরিক অধিকার সহ বসবাসের ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের গুরু দায়িত্ব ও আশু কর্তব্য সেদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। সে দায়িত্ব পালন না করে উল্টো সংখ্যালঘুদের প্রতিরোধী হবার এবং মাথা উঁচু করে চলার আহবান যুক্তিসংগত নয়। স্বাধীন দেশে প্রতিবেশির সংগে যুদ্ধ ও হানাহানি করে বাঁচতে হবে কেন? সংখ্যাগুরুদের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন ও আক্রমণ বন্ধের মাধ্যমেই কেবল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ় করা সম্ভব।

অন্যের মাল 'গণিমতের মাল' হিসাবে লুটপাটের যোগ্য এ ধারণা বদলাতে হবে। এরপর আসবে বিচারের প্রশ্ন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে "জিরো টলারেন্স" এর আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও তদন্ত, বিচার ও শাস্তিদানের বিষয়টি যথাযথভাবে এগোচ্ছে না। প্রশাসনের গাফিলতি অর্থাৎ সর্ষের মধ্যে ভূত আছে কি না ভেবে দেখা দরকার। এ ব্যাপারে যতটা বাগড়ম্বর শোনা যায় ততটা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনা সত্ত্বেও সাহাবুদ্দিন চুন্নু কমিশনের রিপোর্ট এখনও আলোর মুখ দেখেনি এবং বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থাও করা হয়নি। এটা ভাল আলামত নয়। এতে বিচারহীনতা বা বিলম্বিত বিচারের সংস্কৃতি তৈরী হচ্ছে। যা দুস্কৃতকারীদের উৎসাহ যোগানোর শামিল।

মুক্তিযুদ্ধে গাঁও গেরামের কথা

শুনুন একটা গল্প বলি। কৃষকের সংগ্রামের গল্প, মুক্তিযুদ্ধের গল্প। যখন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে উঠেছিল। এ গল্প অতি সাধারণ মানুষের অনন্যসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প, লিলিপুট কি করে গালিভার হয়ে উঠেছিল– সেই গল্প। সময়টা একাত্তরের। স্থান পীরপুর গ্রাম, চালাকচর বাজারসংলগ্ন মনোহরদি থানা, সাবেক নরসিংদি মহকুমার অন্তর্গত। নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের এক গ্রাম, ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় যেন। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ নিজের জমিতে হাডুডু, নৌকা বাইচ, ফুটবল, ভলিবল, সাঁতার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতো বছর জুড়ে, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জন্মোৎসব, নাটক, একুশে প্রভাতফেরী মাতিয়ে রাখতো গ্রামীণ এই জনগোষ্ঠীকে। তদুপরি ছিল ঈদ উৎসব, দূর্গাপূজা, মহররম প্রভৃতি যা ধর্মীয় গন্ডি পেরিয়ে সামাজিক সার্বজনীন উৎসবে সাজাতো অখ্যাত গ্রামগুলোকে। প্রতিটি সকাল শিশু- কিশোর-কিশোরীর কলকাকলীতে মুখরিত হতো। দুটি প্রাইমারী স্কুলে কচি কণ্ঠের কবিতা আবৃত্তি, নামতার কোরাস আর গুণগুণতির শতকিয়া নামতা ধ্বনি প্রতিধ্বনির সাথে তাল মেলাতো নানা রঙের বিচিত্র পাখির কলকাকলির ধ্বনি-তরঙ্গ। গ্রামটির সহজাত নেতা হয়ে উঠেন শওকত আলী। একাধারে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক এবং কৃষককর্মী। সেই দিনগুলোতে হাট তোলার নামে ইজারদাররা কৃষকদের উপর চালাতো নির্মম শোষণ বঞ্চনা। গ্রামীণ কৃষক জীবন তোলার অত্যাচার ও মহাজনী শোষণে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল ও পণ্য নিয়ে হাটে গেলে ইজারাদাররা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিত চারটা লাউয়ের একটি, চারটা ডিমের একটি, সবজির একাংশ, প্রতি খাসি বিক্রি হলে কুড়িটাকা তোলা ইত্যাকার জবরদস্তির রাজত্ব কায়েম করেছিল ইজারাদাররা। ক্ষীণদেহী কৃষকের ক্ষীণ প্রতিবাদ লেলিয়ে- দেয়া মাস্তানেরা ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতো প্রায়শই। পীরপুরের শওকত ইজারাদারের এহেন অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন শাণিত যুক্তি দিয়ে এই বেআইনী কৃষক মারার কর্মকাণ্ড বন্ধে ইজারাদার ও প্রশাসনকে অনুরোধ-উপরোধ, আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থ হলেন শওকত। কিন্তু ব্যর্থতা মেনে নিলেন না। অতঃপর তিনি পাড়ায় পাড়ায় 'খুলি বা ঠুলি' বৈঠক করে কৃষকদের একতাবদ্ধ করলেন। গড়লেন কৃষক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। প্রতি বাড়ি এক লাঠি, এক যুবক এক আনা, এই আওয়াজ সম্বল করে শওকত বাহিনী লড়লেন ইজারাদারদের মাস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে। উভয় পক্ষে অগুনিত আহত ও রক্তারক্তির ঘটনা ঘটলো, তবুও নড়লো না প্রশাসনের টনক। শওকত বাধ্য হয়ে হাট বন্ধ, হাট হরতালের ঘোষণা দিলেন। চালাকচর বাজারের চারপাশে গ্রামের কৃষকরা ফুঁসে উঠল প্রতিবাদে, হাটে কোন কৃষক আসে না, গাছ-গাছালিতে কাক চিলও বসে না। এক অদ্ভুতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন। চালু হয় গ্রামটির হাট, তোলাবিহীন কৃষকের হাট। এতে করে ইজারাদারের মাথায় হাত উঠল, প্রশাসনের টনক নড়লো। এভাবে বন্ধ হলো বেআইনী তোলার অত্যাচার। আদায় হলো কৃষকদের দাবি ও অধিকার। বীর হয়ে উঠলো শীর্ণদেহী শওকত। তার বীরত্ব কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, সমগ্র নরসিংদি জুড়ে। কৃষকদের এই সংগ্রামের বুদ্ধিপরামর্শ, সাহায্য-সহযোগিতা জুগিয়েছিলেন কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ, ফয়েজ মাষ্টার, ফজলুল হক খন্দকার, সামসুল হক, আব্দুল হাই, বাবর আলী, মুজিবর রহমান প্রমুখেরা এঁরা ছিলেন কৃষকের সুখ দুঃখের সাথী, কৃষকের জীবনের শরিক মানুষজন।

দুই

খর্বকায় শিক্ষক ও কৃষকবন্ধু অশ্রু আর আগুনে পুড়ে কত বিশাল আর বিরাট হয়ে উঠেছিল হাজার হাজার মানুষের কাছে, সেই কাহিনীটি এবার বলি। একাধারে সময়কালটা ছিল চরম দুঃখ ও কষ্টের, একসাথে গৌরবদীপ্ত সংগ্রামের। ২৫ শে মার্চ একাত্তর। গণহত্যা ও ধ্বংসলীলার ধারা ধরে হানাদার পাক বাহিনী গ্রাম-গ্রামান্তর দখলের অভিযানে মেতে ওঠে। ইতোপূর্বে ঢাকা শহরে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধে অসমর্থ কতিপয় ছাত্রকর্মী গ্রামে প্রতিরোধ গড়তে সচেষ্ট ছিল। এরা ডেমরা- কায়েতপাড়া- দিতপাড়া- ঠুলঠুলিয়া- চনপাড়া- পূবগাঁও, মুড়াপাড়া, ঘোড়াশাল, পলাশ, শিবপুর, মনোহরদি, রায়পুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ছাত্র যুবক কৃষকদের জনযুদ্ধে উদ্দীপ্ত করতে উদ্যোগী হলেন। একাত্তরের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এধরনের এগার জনের একটি কর্মীদল হাজির হয় পীরপুর গ্রামে। শওকত এদের আশ্রয় জোগালেন, তিনি গ্রামসভা ডেকে কৃষক-কৃষাণী ভাই-বোনদের বললেন এদেশের স্বাধীনতার জন্য, কৃষক- শ্রমিকের শোষণমুক্তি ও অধিকারের জন্য এরা সংগ্রামে নেমেছে, ঘর-বাড়ি, বাপ-মা, ভাই- বোন ছেড়েছে। এদের আশ্রয় ও খানাপিনা জোগাবে কারা? শওকতের প্রশ্নে একবাক্যে ঐক্যতানের সুরে কৃষক-কৃষাণীরা বললেন, আমরা সকলে ভাগ করে খাবো। শীর্ণকায় কৃষক-কৃষাণীরা হঠাৎ যেন বিরাটকায় হয়ে উঠলো।

সেই সময়কার স্বাধীনতার আগুনের হলকায় পীরপুরের কৃষকেরা তেতে উঠেছেন। নিজেদের অভাব অনটনকে অবজ্ঞা করে মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্ব নিলেন। শওকত অভাবী কৃষকদের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে স্থির করে দিলেন, এগারটি বাড়িতে ১১জন ছাত্রকর্মী আশ্রয় নেবেন। কিন্তু তাদের নাস্তা ও দু'বেলার আহার এক একজন এক এক কৃষকের বাড়িতে সম্পন্ন করবেন, এমনভাবে যে এক কৃষকের বাড়িতে দুবার যেন যেতে না হয়, এই প্রকারের আহার ও নাস্তার তালিকা তৈরি এবং যথাযথভাবে তা কার্যকর করা হয়। তালিকা অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবকরা এক একজনকে এক এক বাড়িতে নাস্তা ও আহারের জন্য নিয়ে যেতেন। প্রতিদিন নিত্যনতুন কৃষকের বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের কথা নতুন জীবনের স্বপ্নের কথা আলোচিত হতো, আলোড়িত হত শিশু- কিশোর নরনারীসহ কৃষক পরিবার। তিন হাজার পরিবারের বসতি পীরপুর গ্রামে তখন একজন রাজাকারও ছিল না। শওকতের বাড়িতে যে মুক্তিযোদ্ধাটি আশ্রয় পান জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

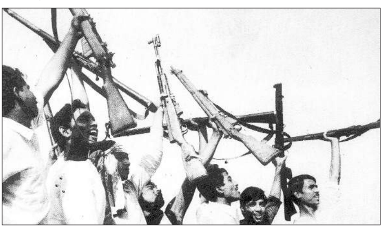

শওকতের পিতা ধর্মপ্রাণ মুসলমান। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। দুটি কোঠার এই বাড়িতে বাহির ঘরে পিতা ওমর আলী চৌকিটাতে ঘুমাতেন, কদাচিত ছোট ছেলে সামসু কর্মস্থল থেকে বাড়িতে এলে বৃদ্ধের চৌকির এক পাশে মাটিতে বিছানায় ঘুমাতো। সামসুর জায়গায় মাদুর পেতে ঘুমায় মুক্তিযোদ্ধা সরোজ। ওমর আলীর সাথে সরোজের আলাপচারিতা ছিল আন্তরিক ও স্বচ্ছন্দ। পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতা যে হালাকু খানদের হার মানিয়েছে, ফেরাউন- নমরুদদের লজ্জার কারণ হয়ে উঠেছে বহুদর্শী ওমর আলী তা বলতেন। তাঁর প্রধান প্রশ্ন ছিল, বাংলার যুবশক্তি এই হানাদার দুশমনদের পরাজিত করতে পারবে কি? জবাবে সরোজ আশাবাদের কথা শোনাতো। ওমর আলী ফজরের নামাজ শেষে মোনাজাত করতেন আলাহ্‌র দরবারে। মোনাজাতের সময় ওমর আলী কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'হে আলাহ্‌ বাংলার ওপর হার্মাদ পাক বাহিনীর অত্যাচার বন্ধ কর'। বাঙালি মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট যারা করছে সেই জলাদদের শাস্তি দাও, যোগ্য বিচার কর। 'হে আলাহ্‌ পাকিস্তান যেন ভেঙে না যায়, তার হেফাজত করো'। বৃদ্ধ ওমর আলীর এই স্ববিরোধী মোনাজাত নিয়মিত শুনতেন পঙ্কজ। শুনতেন বৃদ্ধের আহাজারী। ভেতরের ঘরে শওকত সস্ত্রীক পুত্রকন্যাসহ পিতার মোনাজাত শুনতেন। সকালে ও বিকালে গ্রামের স্কুলমাঠে চলতো ছাত্র-যুবকদের কুচকাওয়াজ মহাসমারেহে। গজারীর কাঠ ও লাঠি হাতে লুঙ্গি এবং প্যান্ট পরিহিত কৃষক ও ছাত্র যুবকরা ট্রেনিং নিতো। মাতৃভূমি মুক্ত করার এই মহা উৎসব প্রত্যক্ষ করতেন ওমর আলীসহ প্রবীণ কৃষকেরা, মেয়েরা দেখতেন আড়াল থেকে। বক্তৃতা হতো গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ও পদ্ধতি নিয়ে। 'আক্রমণ কর ও সরে পড়ো' অন্যসময়ে 'কৃষক ও গ্রামবাসীর সঙ্গে মিশে যাও' ইত্যাদি কৌশলের পাশাপাশি ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের কথা ও কাহিনী বলা হতো। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি গেয়ে শুরু হতো প্রশিক্ষণপর্ব।

সেদিন সন্ধ্যায় মুক্তিযোদ্ধাদের কুচকাওয়াজের পরে ওমর আলী দাওয়ায় বসে হুঁকা টানছিলেন। শওকত ও সরোজ মুজিবনগর রেডিও শোনায় ছিল মশগুল। এই সময় কনিষ্ঠপুত্র সামসুকে সন্তর্পণে বাড়ি ঢুকতে দেখা গেল, দুই বগলে দুইটি টু ইন ওয়ান। পিতা ওমর আলী হাঁক দিলেন তোর হাতে ওগুলো কী জিনিস সামসু?' হতচকিত সামসু জবাব দিলো 'টেরানজিসটার'। ওমর আলী কঠিন কণ্ঠে বললেন 'বুঝেছি লুটের মাল নিয়ে এসেছো, হিন্দুর বাড়ি লুট আর বিহারীর সম্পত্তি লুট করে দ্বীনের পথে হাঁটা যায় না। আলাহ্‌র গজব পড়বে তোর ওপর। এই বাড়িতে তোর জায়গা হতে পারে না। দূর হও।'

বেদনাক্লিষ্ট বৃদ্ধ ওমর আলীর মূল্যবোধতাড়িত কথাগুলো আজও কানে বাজে সরোজের। মুক্তিযুদ্ধবিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা অনেকে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে ফিরেছে, ফেরেনি মুক্তিযোদ্ধা শওকত, অনেকের মত। স্বদেশে ফিরে মুক্তিযোদ্ধা সরোজ পীরপুরে শওকতের বাড়িতে আসে শহীদ শওকতকে শ্রদ্ধা ও ওমর আলীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। ঘরের উঠোনে ছেঁড়া গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরিহিত বৃদ্ধ ওমর আলী বাঁশের কঞ্চি চেঁছে টুকরী বানাতে ব্যস্ত, বৃদ্ধের বয়স এক বছরের মধ্যে দশ বছর যেন বেড়ে গেছে। দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে বৃদ্ধের শরীরটি, তিনি ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শওকতের অবদান, ওমর আলীর অবদান, তাদের এই বাড়ির অবদান উলেখ করে মুক্তিযোদ্ধা পঙ্কজ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানালেন। বৃদ্ধ ওমর আলী লা-জবাব থাকলেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কিছু বলতে গিয়ে বাকরুদ্ধ হলেন। দুচোখ ভরে উঠল। বইলো জলের ধারা- অবিরত। শওকতদের সামনের ঘরটিতে যেখানে চৌকিতে বসতেন ওমর আলী দেখা গেল সেখানে বসে আছে জিন্স প্যান্টপরা কনিষ্ঠপুত্র সামসু, পায়ের উপর পা রেখে, মুখে ধূমায়িত সিগারেট। পিতা ওমর আলী যে পুত্রটিকে লুটের মাল নিয়ে ঘরে আসার অপরাধে বহিষ্কার করেছিলেন সেই পুত্রই আজ গৃহকর্তা, হর্তাকর্তা।

গুজব রটিয়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আর কত?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দখলের ঘটনা ঘটে। এ সব ঘটনায় ৬৭ জন আহত ও ৭ জন নিহত হন। এর বাইরেও পঞ্চগড়, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ঝিনাইদহ, পাবনা, যশোর ও বগুড়ায় মঠের অধ্যক্ষ ও সেবায়েতরা খুন হন। গত বছরেই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। তবে এ বছরে সবচেয়ে আলোচিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার নাসিরনগরে। ফেসবুকে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করা হয়েছে– এ অভিযোগ আনা হয় রসরাজ নামে এক স্বল্প শিক্ষিত হিন্দু তরুণের বিরুদ্ধে। এর জের ধরে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করে চালানো হয় ধ্বংসযজ্ঞ। প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, সুশীল সমাজ– প্রথমে কেউ এগিয়ে আসেনি নির্যাতিতদের পাশে। বিচারের বাণীও নিরবে নিভৃতে কেঁদেছে। রসরাজকে গ্রেফতার করার পর যখন আদালতে তোলা হয়, তখন ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার আইনজীবীরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেন– এমন ‘ইসলামবিরোধী’ ব্যক্তির পক্ষে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। অভিযোগ ছিল মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। গুজব রটিয়ে নিরীহ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হয়, তাদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়। অথচ কেউ তাদের পাশে দাঁড়াল না! এ কেমন বিচার? এখন প্রশাসন বলছে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে– রসরাজ এ ঘটনায় আদৌ জড়িত নয়। তাহলে কেন তাকে জেলে নেওয়া হলো? কারা এজন্য দায়ী?

গুজব রটিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে কক্সবাজারের রামুতে, পাবনার সাঁথিয়ায়, কুমিলার হোমনায়। প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহজেই বুঝতে পারে কোনটি গুজব, আর কোনটি সত্য ঘটনা। এখন জাতীয় সংসদ, সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ– সব কিছুই ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের দখলে। দেশের সর্বত্র এ দলের নেতা-কর্মীরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। তারা কেন বুঝতে পারবে না কোনটি সত্য আর কোনটি গুজব? ফেসবুকের মতো আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক অপশক্তি মানুষে মানুষে বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য সুকৌশলে গুজব রটায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সুশীল সমাজ– এদের অনেকেই ধরে নেয় যে নিশ্চয়ই সাঁথিয়া-রামু-হোমনা-নাসিরনগরের হিন্দু-বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্মের অবমাননা করেছে। ধর্মান্ধ চরমপন্থি শক্তি বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো অরাজকতার দিকে ঠেলে দিতে চাইছে, এটা অনেকেই বলেন। এর পেছনে সত্যতাও রয়েছে। তাহলে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে কেন দ্বিধা? এ ষড়যন্ত্রকারীরা যখন মাঠে নামে তখন কেন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ করা হয় না? শঙ্কা হয়, এমন অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশে আরও গুজব রটনা করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা চালানো হবে, যার পরিণতিতে সংখ্যাঘুরা নিজেদের আরও অসহায় মনে করবে। তারা হয়ে পড়বে আরও উদ্যোগহীন। তারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ভয় পাবে। সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উৎসাহ বোধ করবে না। এটাও মনে রাখতে হবে যে গুজব রটনাকারীরা দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি নিয়ে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে থাকে। আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীকে এ বিষয়টির প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে। তারা জঙ্গিদের মোকাবেলায় যথেষ্ট সফল। তাহলে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা কেন রুখে দেওয়া যাবে না?

ধর্মান্ধদের দাপট বাংলাদেশে স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী কেউ চাইতে পারে না। ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিও রেখেছিল।

স্বাধীনতার মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থেকেই এটা তারা করেছিল। জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। যে অপশক্তি সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছে, তাদের কেন আমরা সম্মিলিত চেষ্টায় রুখতে পারব না?

এটাও মনে রাখতে হবে যে গুজব রটনাকারীরা দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি নিয়ে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে থাকে। আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীকে এ বিষয়টির প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে। তারা জঙ্গিদের মোকাবেলায় যথেষ্ট সফল। তাহলে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা কেন রুখে দেওয়া যাবে না?
ধর্মান্ধদের দাপট বাংলাদেশে স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাসী কেউ চাইতে পারে না। ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিও রেখেছিল। স্বাধীনতার মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থেকেই এটা তারা করেছিল। জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাদের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। যে অপশক্তি সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছে, তাদের কেন আমরা সম্মিলিত চেষ্টায় রুখতে পারব না?

মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সূত্রিতা কমিয়ে আনার জন্য আশু ব্যবস্থা নেয়ার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এটর্নি অশোক কর্মকার বর্তমান সরকারের সময় ধর্মীয় ও আদিবাসী সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ অনেক বেড়ে যাওয়া এবং সরকারের প্রশাসন ও সরকারি দলের নেতা কর্মীদের সংখ্যালঘু নির্যাতনে ভূমিকা বেড়ে যাওয়ার তীব্র নিন্দা করেন।

হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের অন্যতম ডিরেক্টর জে কানসারা মানবকল্যাণে আমেরিকা হিন্দু ফাউন্ডেশন কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে তার কিছু স্লাইড শো প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থিত সকলের জন্য প্রদর্শন করেন। তরুণ প্রজন্ম হিন্দু স্টুডেন্ট কাউন্সিল এর প্রেসিডেন্ট প্রিয়তা দে তরুণ তরুণীদের এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান।

পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু সেবা সংস্থার সানজেস ধানঝা ও কিরণ কুমারী কিরন প্রথমেই বাংলাদেশের এই বিজয় দিবস উদযাপন আলোচনায় উপস্থিত হতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁরা বাংলাদেশের শহীদদের আত্মত্যাগের কথা জেনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বর্বরতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে কিন্তু পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সেখানে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, পাকিস্তানে গড়ে প্রতিমাসে ২৫টি ধর্মান্তরিত করার ঘটনা ঘটে। নির্যাতন নিপীড়ন সেখানকার নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। এর প্রমাণ স্বরূপ ৩০ মিনিটের একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। তাদের সাথে আগত রিতা বলেন, পাকিস্তানে হিন্দু নারী নির্যাতন অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। এ থেকে উত্তরণে বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা, ঘর থেকে তুলে এনে ধর্ষণ করা, হত্যা করা পাকিস্তানের প্রতিদিনের চিত্র। তিনি সকলকে প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আলোচনা শেষে উক্ত সভার সভাপতি অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং পানাহার রেস্টুরেন্ট পরিবেশিত চমৎকার স্ন্যাকস ও চা চক্রের মধ্য দিয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশে সকল কার্যক্রম শেষ হয়।

নির্বাচন কমিশনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুঃখজনক ও বেদনার। এমন কোন নির্বাচন নেই, যে নির্বাচনে সংখ্যালঘুরা অহেতুক নিগৃহণ, নিপীড়ন, নির্যাতনের শিকার হয় নি। রাজনৈতিক দলনির্বিশেষে নির্বাচনে প্রভাবশালী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় সকল দল ও দলীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমবাদে একই কথা প্রযোজ্য। অতীতে যে সব নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে সে সব কমিশন নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিলেও দেখা গেছে, তা সবই আপ্তবাক্য মাত্র। বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন দেখা যায় নি। সে কারণে যে কোন ধরণের নির্বাচন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কাছে আজ অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, নির্বাচনের ব্যাপারে ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে যা গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্যে শুভ নয়। নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর যাতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আশা ও আস্থায় বুক বাঁধতে পারে এবং নির্বাচন কমিশনে তাদের অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় সে লক্ষ্যে নতুন নির্বাচন কমিশনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্ততঃ একজন বিশিষ্টজনকে নিয়োগ দেওয়া আবশ্যক। স্মারকলিপি প্রদানকালে ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন হিউবার্ট গোমেজ, ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় ও সাবেক জেলা প্রশাসক দেবাশিস নাগ।

বিদায় ২০১৬, স্বাগত ২০১৭

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

আছে- এ দাবি মজবুত নয়। প্রায় প্রতিদিনই জঙ্গি ঘাঁটি ও অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে, জঙ্গিরা ধরা পড়ছে কিংবা আইন-শৃংখলা বাহিনীর গুলিতে মারা পড়ছে। জঙ্গিবাদ নিকেশ করতে হলে মনোজগতে পরিবর্তন বা আত্মানুসন্ধানের বীজ বপন করতে হবে। এ কাজটা কঠিন। কিন্তু অস্তিত্বের স্বার্থে করতে হবে। এই পরিবর্তনই জঙ্গিবাদকে ধ্বংস করতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির চর্চার বিকাশ প্রয়োজন। মুখে ধর্মনিরপেক্ষতা, কাজে ধর্মনিরপেক্ষতার বিপরীতে অবস্থান এবং স্বার্থপ্রণোদিত পদক্ষেপই আমাদের বিপদ ঘটাচ্ছে। এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ইংরেজি নতুন বছর যদি আমাদের এই অঙ্গীকারকে দৃঢ় ভিত্তি দিতে পারে, জঙ্গিবাদের বিপদ অবশ্যই কেটে যাবে। ২০১৭ সাল এই নতুন প্রত্যয়ের সূর্যোদয় ঘটাক, এটাই কামনা।

এদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা ‘এথনিক ক্লিনজিং’ এর শিকার। তারা এখন অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে, তাদের সংখ্যা দিনদিন নিম্নগামী হচ্ছে। আজ আট বা নয় শতাংশের নিচে নেমেছে তাদের হার। এ অবস্থা একদিনে তৈরি হয়নি। কিছু সময় বাদ দিলে স্বাধীনতার পর থেকে তারা আক্রান্ত, মন্দির-উপাসনালয়ে হামলা ও দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে দেয়া হয়েছে, দেবোত্তর সম্পত্তি ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বাড়িভিটা জবর দখল করা হয়েছে, শত্রু সম্পত্তি আইনের কালো থাবা তাদের দেশ থেকে বিতাড়ন করেছে। ধর্ষণ ও ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দলগুলো তা করছে শুধু নয়, এসব ঘটনায় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া ধর্মনিরপেক্ষ দলের নেতা-কর্মীদের নাম আসছে। এমনকি ‘জয় বাংলা’ শোগানকে পর্যন্ত কলুষিত করা হয়েছে। এই অবস্থা সত্যি সত্যি দুঃসহ। সাম্প্রতিক সময়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কৌশলে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ফেসবুকের মাধ্যমে কিংবা ইসলাম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে হামলা আতংক হয়ে দেখা দিয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে ব্রাক্ষণবাড়িয়ার নাসিরনগর। রসরাজ একজন মৎস্যজীবী, আধুনিক প্রযুক্তি থেকে শতহাত দূরে। তবুও তাকে সামনে এনে লঙ্কাকান্ড ঘটানো হয়েছে। ১০টিরও বেশি মন্দির ও শতাধিক হিন্দু বাড়ি আক্রান্ত, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়েছে। এখন গোয়েন্দারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ধর্ম অবমাননার কাজটি রসরাজ করেনি। তাকে ফাঁসানো হয়েছে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। বাস্তবতা হচ্ছে নিরীহ-নির্দোষ শতাধিক হিন্দু পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেছে, এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের সামনে। রসরাজ নির্দোষ হলেও এখনো কারাগারে। আসলে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালানো হলে তারা দেশত্যাগে বাধ্য হবেন এবং তাদের জমিজমা জবরদখল করা যাবে, এই সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য থেকেই ইসলাম অবমাননার নামে সাম্প্রদায়িক শক্তি ছক তৈরি করে। দুঃখজনক হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও জায়গাজমি জবরদখলে কোন রাজনৈতিক বিভাজন থাকে না। স্থানীয় যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নাসিরনগরে কান্ডটি ঘটিয়েছে তাদের বিচার হলেই রাষ্ট্রযন্ত্র নিরপেক্ষতার নজির স্থাপন করতে পারবে, এদিকেই তাকিয়ে আছেন সংখ্যালঘুরা। সংখ্যালঘুরা আরও মনে করেন, বিচারের বাণী যদি নিরবে-নিভৃতে কেঁদে না ফেরে তাহলেই অন্ধকার কেটে যাওয়ার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। ২০১৭ সালে এই নতুন অধ্যায়ের অভ্যুদয় ঘটুক। একাত্তরের বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক, নববর্ষে এই হোক শুভ কামনা নিগৃহীত-নির্যাতিত মানুষের।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ৭ দফা দাবি আদয়ে রাজপথে নেমেছে। এটা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। চার দশক ধরে চলে আসা এ লড়াই এখন আরও সমন্বিত রূপ নিয়েছে। এছাড়া বিকল্প নেই। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নির্যাতন-নিপীড়ন-বৈষম্য-বঞ্চনা থেকে মুক্তির যে স্বপ্ন ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা দেখেছিল, তা এখনো স্বপ্ন থেকে যাওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ। রাজনীতিকদের একটি অংশ এবং প্রগতিশীল বিশিষ্ট জনেরা ৭ দফা দাবির সঙ্গে একমত। তাঁরা একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। এই একাত্মতা ২০১৭ সালে সংখ্যালঘুদের সংগ্রামকে যেন আরও এগিয়ে নিয়ে যায়, এই প্রত্যাশাই আমরা করছি।

পরিষদ বার্তার ই-মেইল সংবাদ পাঠানো প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র ‘পরিষদ বার্তা’র ই-মেইল ঠিকানা parishadbarta@gmail.com-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশিষ্ট খবর বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

SH HINDU BUDDHIST CH
YO PARISHAD USA, INC.
EXIT

বিজয় দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভা।

ছবি : পরিষদ বার্তা

বিজয় দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কে ঐক্য পরিষদ ও হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের যৌথ আলোচনা সভা

মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

॥ নিউইয়র্ক থেকে প্রতিনিধি ॥

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ নিউইয়র্কস্থ জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড -এ অবস্থিত পানাহার রেষ্টুরেন্টে সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র ও হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও “এ ডে ইন দা লাইফ অফ এ পাকিস্তানি হিন্দু” তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র এর সেক্রেটারী স্বপন দাসের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র এর সভাপতি রেভা: জেমস্ রায়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌধ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র এর সম্মানিত গভর্নিং বড়ির চেয়ারম্যান এটর্নী অশোক কর্মকার এবং অন্যতম সভাপতি নয়ন বড়ুয়া। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর জে কানসারা। তথ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু সেবা সংগঠনের সানজেস ধারঝা ও কিরণ কুমারী। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন নিকোলাস ও কোনেল, ম্যাক ডর্মেট উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র এর সেক্রেটারী স্বপন দাস বাংলাদেশের বিজয় দিবসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তাৎপর্য তুলে ধরেন তার স্বভাব সুলভ বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র এর যুগ্ম সম্পাদক প্রিয়তোষ দে, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদের আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করতে হবে সকলে মিলে। সংঘাত এড়িয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং শিক্ষানুরাগী অধ্যাপিকা হোসনে আরা তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিজয়ের আনন্দের কোন বিকল্প নাই। তিনি নারী পুরুষ ভেদাভেদ ভুলে যার যার স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে দেশের স্বার্থে কাজ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র এর সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিষ্ণু গোপ বলেন, বিজয়ের আনন্দ ধরে রাখতে ধর্মীয় বিদ্বেষ দূর করতে হবে। তিনি সকলকে সচেতন হবার তাগিদ দেন এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের আহ্বান জানান।

সংগঠনের ফিনান্স সেক্রেটারি সমর রায় বলেন যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর যে অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে তা উদ্বেগজনক। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক ও সোচ্চার হতে হবে। বাংলাদেশ ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল এর উমা চক্রবর্তী তার বক্তব্যে, উক্ত আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন দেশের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন হতে হবে দূর্নীতির বিরুদ্ধে, সোচ্চার হতে হবে দূর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে, নইলে স্বাধীন বাংলাদেশ আবারও পিছিয়ে পড়বে। তিনি মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র এর গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান এটর্নী আশোক কর্মকার বলেন, ধর্মীয় বিদ্বেষ ভুলে শান্তির লক্ষে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি প্রশাসন ও আইনের শাসন জোরদার করার তাগিদ দেন। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন করে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

পৃষ্ঠা ৭

সংখ্যালঘু নির্যাতনে ২০১৬ সাল ছিল উদ্বেগজনক

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায়কে হত্যার মধ্য দিয়ে মন্দিরের পুরোহিত ও সেবায়েত হত্যাকাণ্ডের শুরু। বছরজুড়ে হত্যা-জখম-নির্যাতনের এই ধারা অব্যাহত ছিল। ধর্মীয় গুরুদের পাশাপাশি সাতক্ষীরার আশাশুনিতে হিন্দুধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ নির্যাতনের শিকার হন বছরের প্রথমার্ধে। বছর শেষ হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বছর শেষে মানবাধিকার পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের দিক থেকে ২০১৬ সাল ছিল উদ্বেগজনক।

বছরের শেষদিনে আসক বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৬ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আটটি জাতীয় দৈনিক ও নিজেদের অনুসন্ধান থেকে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করে আসক। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ১৯২টি বাসস্থান, ২টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ১৯৭টি প্রতিমা, পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, ৫টি জমি ও বসতবাড়ি দখলের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় ৬৭ জন আহত ও ৭ জন নিহত হন। এর বাইরে পঞ্চগড়, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ঝিনাইদহ, পাবনা, যশোর ও বগুড়ায় মঠের অধ্যক্ষ ও সেবায়েতরা খুন হন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে যশোরের কেশবপুর থেকে প্রবীণ মলিক নামের একজন মন্দিরের সেবায়েত নিখোঁজ হওয়ার ১৩ দিন পর বাড়ির পাশ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়।

এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পর সহিংসতায় সাতক্ষীরার আশাশুনির চার গ্রামের ১০০ হিন্দু পরিবার ঘরছাড়া হয়। ২৯ মে কক্সবাজার সদরের খুরুশকুল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীর সমর্থকেরা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের শতাধিক বাড়িঘর, মন্দির ভাঙচুর করাসহ পিটিয়ে ৩০ জনকে আহত করে। ‘ধর্মীয় অবমাননা’র ধুয়া তুলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায়। নাসিরনগর সদর ও হরিণবেড় গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৫টি মন্দির ও অর্ধশতাধিক বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও প্রশাসনের পাহারার মধ্যেও আরও তিন দফায় মন্দির ও বাড়িঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। একই অভিযোগ তুলে নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে সংসদ সদস্যের সামনে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে শ্যামল কান্তির বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগের কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি।

আসক বলছে, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি না হলেও কিছু ইতিবাচক বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার অপব্যবহার রোধে উচ্চ আদালতের রায়, সংসদ কর্তৃক বিচারক অপসারণবিষয়ক বিধান নিয়ে সংশোধিত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা-সংক্রান্ত হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রদান ইত্যাদি। বিগত বছরগুলোর মতো এ বছরও ’৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২০১৬ সালে ছয়টি রায় প্রদান করেছেন এবং এ বছর দুজন যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে।

দিনাজপুরে হরিজন পল্লীতে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ ১০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত

॥ রতন সিং, দিনাজপুর থেকে ॥

দিনাজপুরে হরিজন পল্লীতে পেট্রোল দিয়ে ১০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগে ৩০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের চাল, নগদ টাকা ও ঢেউ টিন সাহায্য দেয়া হয়েছে।

দিনাজপুর পুলিশ কন্ট্রেল রুম সূত্রে প্রকাশ, ৩ ডিসেম্বর শনিবার ভোর রাতে দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার সেতাবগঞ্জ পৌর এলাকার রেলওয়ে কলোনীর হরিজন পল্লীতে পেট্রোল ঢেলে নাশকতামূলক অগ্নিকান্ডে ১০টি পরিবারের ৩০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভষ্মিভুত হয়েছে। সর্বস্বান্ত হয়েছে হরিজন পল্লীর ১০টি পরিবার। ভোররাতে অগ্নিকান্ডে পরিবারগুলোর মাঝে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। মহিলা ও শিশুদের নিয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ৭ জন আহত হয়। আহতরা স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে। বোচাগঞ্জ উপজেলা দমকল বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে প্রায় আড়াই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে সকাল ১০টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য সোহেল বাসফোর জানান, শনিবার সকালে অগ্নিসংযোগের অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত হরিজন পরিবারের সদস্যরা ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে রেলওয়ে কলোনীর আইয়ুব আলীর বখাটে পুত্র জুয়েল (৩০)কে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। দুপুরে ক্ষতিগ্রস্ত হরিজন রয়েল বাসফোর বাদী হয়ে জুয়েল ও অপর ১ জনের নাম উলেখ এবং অজ্ঞাত আরো ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে বোচাগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেছে। যার থানার মামলা নং ১, তাং- ৩.১২.১৬ ইং।

দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলা পৃষ্ঠা ৩

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২